গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ১৬ - ২২ এপ্রিল ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

শীতলকুচির ঘটনার তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস

কোচবিহারের শীতলকুচির ঘটনা সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ এপ্রিল বিবৃতিতে বলেন, 'পশ্চিমবাংলার নির্বাচনের চতুর্থ দফায় রাজ্যজুড়ে পরিকল্পিত হিংসার ঘটনা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজন সহ পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা দেখেছি, নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত থেকেই সরকার ও বিরোধী বড় দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা যেভাবে তাঁদের বক্তব্যে কুৎসা, কটূক্তি, ব্যক্তিগত গালিগালাজ এবং ধর্মীয় উস্কানিমূলক কথা বলেছেন তাতে বাংলার রাজনীতি যথেষ্ট কলুষিত হয়েছে। চতুর্থ দফার নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা এবং মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করছে, এত বিপুল পরিমাণে কেন্দ্রীয় ও আধাসামরিক বাহিনী মজুত করা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন করতে ব্যর্থ। কিছুদিন আগেই যখন নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 'আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাবার' অনুমতি দিয়েছিল— আশঙ্কা সেদিন থেকেই ছিল। শীতলকুচিতে তা মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হল। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্তৃপক্ষ 'আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে' বলে যে সাফাই গাইছে— তার কোনও রকম সত্যতা নেই। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। ভোটকেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও কী করে মূল প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবদমান দু'টি দল উন্মত্ত কর্মীদের জড়ো করতে পারল, বিপুল পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এই হিংসাত্মক ঘটনা কেন আটকানো গেল না— এ প্রশ্নের উত্তর নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে। তবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার, সতর্কীকরণ, শূন্যে গুলি বা হাঁটুর নিচে গুলি— এ সব কিছু না করেই সরাসরি মাথা বা বুকে গুলি করার দ্বারা এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলি চালিয়েছে।

এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের কাছে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। নানা অজুহাতে তারা সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালায়। কোচবিহারের ঘটনা তারই আর একটা মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত।

যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় প্রায় দৈনিক হাজিরা দিচ্ছেন, সেই কেন্দ্রীয় সরকারও কি এর দায় এড়াতে পারে? আমরা এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত, নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, দোষী কেন্দ্রীয় পুলিশের শাস্তি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরপেক্ষ ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

হত্যাকারী কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ১১ এপ্রিল কোচবিহার শহরে মিছিল

বিজেপি সভাপতির ঘৃণ্য বক্তব্যে তীব্র ধিক্কার

১০ এপ্রিল শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার জন সহ মোট ৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের 'শীতলকুচিতে দুষ্টু ছেলেরা গুলি খেয়েছে, দুষ্টু ছেলেরা বাংলায় থাকবে না, আইন হাতে নিলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে' বক্তব্যকে ঘৃণিত, ধৃষ্টতাপূর্ণ, অমানবিক, ফ্যাসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে পরদিন বিবৃতি দিয়েছেন এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এই একটি কথাতেই বিজেপির আসল চেহারা নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। ক্ষমতার লালসায় বিজেপির কাছে মানুষের জীবনের যে কোনও মূল্য নেই এবং ক্ষমতার জন্য মানুষ হত্যা করতে যে তারা কোনও পরোয়া করে না, দিলীপ ঘোষের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে দলমত নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানোর আহ্বান জানান।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা র‍্যামসে ক্লার্কের জীবনাবসান

আমেরিকার প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল, মহান মানবতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক আগ্রাসন বিরোধী সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক র‍্যামসে ক্লার্ক ৯ এপ্রিল নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে র‍্যামসে ক্লার্ক, মানিক মুখার্জী সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। ২৭ নভেম্বর, ২০০৭

র‍্যামসে ক্লার্কের মৃত্যুতে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম গভীর শোক জ্ঞাপন করেছে। একটি শোকবার্তায় সংগঠনের সহ-সভাপতি মানিক মুখার্জী জানিয়েছেন, অ্যাটর্নি জেনারেল থাকাকালীন র‍্যামসে ক্লার্ক নাগরিক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার

চারের পাতায় দেখুন

কর্পোরেট স্বার্থেই কৃষককে বলি দিচ্ছে বিজেপি সরকার

সারের দামবৃদ্ধি

বিপুল হারে সারের দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেই ভোটের জন্য আপাতত ঢোক গিলেছে বিজেপি সরকার। ভারতের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকো (ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড) বিভিন্ন রকম সারে ৪৬ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশ হারে দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। ইউরিয়া সারের পর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)। তাঁর দাম ৫০ কেজির বস্তায় ১২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৯০০ টাকা। প্রতি বস্তায় বৃদ্ধি ৭০০ টাকা। অন্যান্য সারের দামও বেড়েছে চড়া হারে। এই বৃদ্ধির ফলে কৃষি আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ল। কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার সঙ্কট আরও বাড়ল। আর সাধারণ মানুষ, যারা কৃষিপণ্য কিনে খান, তাদের উপরও মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপল। যদিও দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করেই পশ্চিমবঙ্গে চলা ভোটের কথা ভেবে আপাতত তা কার্যকরী হবে না বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইফকো।

তবে ভবিষ্যতে দামবৃদ্ধির বিপদ থাকছেই। এ জন্য কে দায়ী? মোদি সরকার বলছে তারা দাম বাড়ায়নি। বাড়িয়েছে সার কোম্পানি। সার কোম্পানি কী করে দাম বাড়াতে পারছে? কারণ সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই কেন? কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রায় তুলে দিয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যে নীতি

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতি জেনেও কেন চুপ ইডি?

জবাব দিক বিজেপি সরকার

ফ্রান্সের দাসো এবং তার অংশীদার থালেস-এর কাছ থেকে রাফাল বিমান চুক্তির জন্য ঘুষ নিয়ে তাদের পক্ষে দরাদরিতে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি করে দিয়েছিল এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। শুধু তাই নয় অগুস্তা হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তের সময় ভারতের তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি একথা জেনেও কোনও তদন্ত চালায়নি। সম্প্রতি এই সত্যই সামনে এনেছে 'মিডিয়াপার্ট' নামে প্যারিসের একটি অনলাইন সংবাদ সংস্থা।

সম্প্রতি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত তাদের অনলাইন রিপোর্ট প্রকাশ করে সংস্থাটি জানিয়েছে, সুষেণ গুপ্তা নামে ভারতের এক ব্যবসায়ীকে দুই ফরাসি কোম্পানি কয়েক লক্ষ ইউরো দিয়েছে। ভারতের সাথে ফরাসি কোম্পানির চুক্তির সময় যাতে ফরাসিরাই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্যই এই অর্থ দাসো কেম্পানি খরচ করেছে। রিপোর্টটি বলছে, এই তথ্য ইডি জানতে পেরেছিল অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তের সময়েই। কিন্তু সেই সময় কেস ফাইলে ইডি বলেছিল, এই তথ্য নিয়ে আলাদা তদন্ত হবে। কিন্তু ২০১৯ থেকে আজ পর্যন্ত এ নিয়ে তদন্ত দূরে থাক, বিষয়টিকে যেন ভুলেই বসে আছে ইডি! কার নির্দেশে? এ সত্য আজ জানতে চায় ভারতের জনগণ।

মিডিয়াপার্ট দেখিয়েছে, সুষেণ গুপ্তা প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোপন নথি হাতিয়েছে এবং তা ব্যবহার করে দরকষাকষির সময় বিমানের দাম বাড়িয়ে নিতে পেরেছে দাসো এবং থালেস। সংবাদসংস্থাটির নথি বলছে, ভারতীয় তদন্তকারী হিসাবে ইডি এই তথ্যও পেয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি। দাসো কোম্পানি গুপ্তাকে ভাড়া করেছিল ২০০০ সাল নাগাদ, যখন কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেসের মনমোহন সিং সরকার। সেই সময় ভারত সরকার ১২৬টি যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি করতে চেয়েছিল। এই সময় থেকে শুরু করে ১৫ বছর ধরে দুটি ফরাসি সংস্থা গুপ্তাকে ঘুরপথে বেশ কয়ে লক্ষ ইউরো দিয়েছে যাতে ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার চুক্তিতে প্রভাব খাটানো যায়। যদিও কোনও লেনদেনই সরাসরি গুপ্তার রেজিস্টার্ড কোম্পানির সাথে দাসো বা থালেসের হয়নি। অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারির সময় যেমন হয়েছিল, সেই কায়দাতেই বিদেশে নথিভুক্ত নানা কোম্পানি এবং আইডিএস নামক একটি সফটওয়্যার কোম্পানির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুরপথে লেনদেন হয়েছে বলে মিডিয়াপার্ট জানিয়েছে। এই রিপোর্ট দেখাচ্ছে, ইডি হেলিকপ্টার কেনা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির তদন্তে কেস ফাইলে লিখেছিল, ভারতীয় অফিসারদের ঘুষ দেওয়ার জন্য গুপ্তা এই অর্থ পেয়েছে কি না এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা চুক্তিতে কী ভাবে ঘুষের কারবার চলেছে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

ভারতের জন্য যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত পাওয়ার পর তাদের ভারতীয় অংশীদার বাছতেও গুপ্তাকে কাজে লাগায় দাসো কেম্পানি এবং তার সহযোগীরা। নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় বসার পর ২০১৬ সালে ১২৬ টির বদলে ৩৬টি বিমান কেনার চুক্তি হয়। ফরাসি সরকার এবং ভারত সরকার যৌথভাবে এই চুক্তির মধ্যস্থতা করে। রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান নির্মাণকারী অভিজ্ঞ সংস্থা হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল)-এর সাথে প্রায় সম্পূর্ণ চুক্তি আকস্মিকভাবে বাতিল হয়ে যায়। হঠাৎ করে ভারতীয় ধনকুবের অনিল আম্বানির মালিকানায় সদ্য জন্ম নেওয়া কোম্পানি দাসো কোম্পানির সাথে এই অত্যাধুনিক বিমানের ভারতীয় অংশীদার রূপে আবির্ভূত হয়। আগেকার চুক্তি থেকে ৯০টি বিমান কম দিয়েও ফরাসি সংস্থাটি প্রতিটি বিমানের বিপুল পরিমাণ দাম বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়। ফলে ভারত সরকারকে অনেক বেশি অর্থ গুনে দিতে হয়েছে। মিডিয়াপার্ট তার রিপোর্টে বলেছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষিক্ষেত্রকে ধ্বংস করতেই সারের দামবৃদ্ধি

একের পাতার পর

১৯৯১ সালে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার গ্রহণ করেছে, সেই নীতি মেনেই পরের পর কেন্দ্রীয় সরকার সারের উপর নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলে দিয়েছে। বাজার মানে পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত বাজার। এই পুঁজিপতিরাই ঠিক করেছে কোন সারের দাম কী হবে।

এখন কেবল ইউরিয়া সারের দাম ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। বাকি সব সারের দাম নির্ধারণ করে এই কোম্পানিগুলি। পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুযায়ী কোম্পানিগুলির লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা তোলা। সেই লক্ষ্যেই তারা সারের দাম বাড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তারা দোহাই দিয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির। দেবেই, তারা যে কোনও অজুহাত তুলে জনশোষণের ব্যবস্থা করবে। এদের হাত থেকে চাষিকে রক্ষা করার জন্যই তো সরকারের নিয়ন্ত্রণ দরকার ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও যাতে দেশীয় বাজারে সারের দাম না বাড়ে সে জন্য ভরতুকির ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। অথচ সরকারের নীতি হল ভরতুকি তুলে দাও। ফলে সরসকারের এই বিপুল দামবৃদ্ধি সরকারের নীতিরই পরিণাম। এবং সরকার এজন্য পুরোপুরি দায়ী।

সরকারের এই মূল্যবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেছে এসইউসিআই (সি)। অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) এর তীব্র বিরোধিতা করে কৃষকদের আন্দোলনে নামার আহ্বান জানিয়েছে। কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে কৃষক সংগঠনগুলির যে যুক্তমোর্চা আন্দোলনে সামিল তারও সারের দাম বাড়ানোর কড়া নিন্দা করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের বিক্ষোভ শুরুও হয়েছে।

প্রবল চাপে পড়েছে বিজেপি। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বাস্তবে সারের দাম বৃদ্ধি, বীজের দাম বৃদ্ধি, কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি, সেচের জন্য ব্যবহৃত ডিজেলের দাম বৃদ্ধিঘটতে দিয়ে কৃষকদের আয় অর্ধেক করে দেওয়ার রাস্তা পাকা করে দিচ্ছে বিজেপি। কৃষকরা ক্ষুব্ধ। এমনিতেই কৃষি আইনের মধ্য দিয়ে সরাসরি একচেটিয়া মালিকদের শোষণের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কৃষকদের।

সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার পরিকাঠামো গড়ে না তুলে, বরং যতটুকু পরিকাঠামো ছিল তাকে ধ্বংস করে বা নিষ্ক্রিয় করে কৃষকদের অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর ফলে ক্রমাগত লোকসানের শিকার হয়ে কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। অথচ খাদ্যের চাহিদা কখনও কমে না। ফলে তার সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী সেই কৃষকদের এই সঙ্কট হওয়ার কথা নয়। তা হচ্ছে পুঁজিবাদী পরিচালনার জন্যই।

সার	বর্তমান দাম/৫০কেজি	বর্ধিত দাম	বস্তায় বৃদ্ধি
ডিএপি	১২০০ টাকা	১৯০০ টাকা	৭০০টাকা
এনপিকে (১০ঃ২৬ঃ২৬)	১১৭৫ টাকা	১৭৭৫টাকা	৬০০টাকা
এনপিকে (১২ঃ৩২ঃ১৬)	১১৮৫ টাকা	১৮০০ টাকা	৬১৫টাকা
এলপিকে (২০ঃ২০ঃ১৩)	৯২৫ টাকা	১০৫০ টাকা	৪২৫ টাকা

সারের দাম বৃদ্ধিতে খাদ্যের দামও বাড়বে। গ্রাম শহর নির্বিশেষে সব অংশের গরিব ও নিম্ন আয়ের মানুষদের সংসার চালাতে আরও সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দেশের মানুষকে ঠেলে দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শুরু মনমোহন সিংহের হাত ধরে। তাকে আরও ভয়ঙ্কর রূপ এনে দিল মোদি সরকার।

সারের দাম বৃদ্ধিতে চাষের খরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যাবে। এমনিতেই চাষের বিপুল ব্যয় বহন করতে না পেরে ছোট চাষিদের বিরাট অংশ জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। নতুন দামবৃদ্ধি জমিহারা চাষির সংখ্যাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। সরকার আপাতত পিছু হটলেও আন্দোলন তীব্র করতে হবে।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি) দলের শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মোজাম্মেল হক আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ এপ্রিল রাতে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র দলের জেলা ও আঞ্চলিক নেতারা তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তন্ময় দত্ত, আবুল কাশেম, মানিউল ইসলাম, দীপ্তি রায়, জয় লোধ সহ জেলা ও ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ।

কমরেড মোজাম্মেল হক ছিলেন সদাহাস্যময় ও এলাকার প্রতিটি গরিব-সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়জন। তিনি এলাকায় সমস্ত রকম অন্যায়ের প্রতিবাদে যেমন গর্জে উঠতেন তেমনই দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য বিশেষ করে গরিব মানুষের বিপদে-আপদে সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যা তাঁর চরিত্রে সহজাত গুণ ছিল। ফুলবাড়ি অঞ্চলে দলের সমস্ত আন্দোলনে যেমন তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তেমনই ভূমিহীনদের পাট্টার দাবিতে, জনবহুল এলাকায় বর্জ্য ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার বিরুদ্ধে, চা-শ্রমিকদের উপর মালিকদের বারবার আক্রমণের প্রতিবাদে, জমি হাঙরদের হাত থেকে গরিব মানুষের জমি রক্ষার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি এলাকায় সকলের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। তাই তাঁর শেষযাত্রায় বহু মানুষের সমাগম হয়। অনেককে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। কমরেড মোজাম্মেল হকের মৃত্যুতে দল একজন মরমী, লড়াকু বহুগুণের অধিকারী নেতাকে হারাল।

কমরেড মোজাম্মেল হক লাল সেলাম

শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সংগঠক, দলের কর্মী কমরেড কাশীনাথ রাই ২৬ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে সাতের দশকে যুক্ত হয়ে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। প্রাথমিকে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

১৯৮৩ সালে দলের নেতৃত্বে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা নিয়ে কারাবরণ করেছেন। ১৯৯০ সালের ৪ নভেম্বর দলের আহ্বানে দিল্লি অভিযান আন্দোলনে প্রায় তিন সপ্তাহ দিল্লির বুকে থেকে প্রচারাভিযান ও সমস্ত কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবসরগ্রহণের পরও শিক্ষা আন্দোলনে দীর্ঘদিন সক্রিয় ভূমিকায় থেকেছেন এবং সম্প্রতি গঠিত অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতেও অংশ নিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে ছুটে গেছেন। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক সাহার পক্ষে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড রামানন্দ সিং।

কমরেড কাশীনাথ রাই লাল সেলাম

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

‘আজ বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধের ধারণা সুবিধার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে’

২৪ এপ্রিল ভারতের যথার্থ সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এ দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি আলোচনা (যুব সমাজের প্রতি) থেকে কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।

যুব আন্দোলন যদি সৃষ্টি করতে হয় তা হলে যুবকদের মধ্যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা হটাতে হবে। তা না হলে যুব আন্দোলনে জোয়ার আসতে পারে না। আগেই বলেছি, এ শুধু নিছক আলোচনা, তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারেই আসবে না। আন্দোলনকে এর সঙ্গে মেলাতে হবে, সমস্ত প্রকার অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে তার বুনিয়াদ। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট আদর্শ যদি তার সামনে না থাকে, দেশের সমস্ত পরিস্থিতির একটা সঠিক বিশ্লেষণ যদি তার পিছনে না থাকে, ‘অ্যানালিসিস’ যদি তার পিছনে না থাকে, প্রতিটি সমস্যার কারণ যদি সে সঠিকভাবে ধরতে না পারে— তবে সে আন্দোলন হবে ভুল পথে, সে আন্দোলন জয়যুক্ত হবে না। এ সমস্যার একটি দিক আমি আপনাদের সামনে বলব, আপনারা ভেবে দেখবেন। সমাজে মানুষ যে উদ্বুদ্ধ হয়, ক্রিয়া করে, এই যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবকরা এগিয়ে এসেছিল— কেন? গোটা সমাজের পুরনো যে মানসিকতা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তা গোষ্ঠীবদ্ধ, পরিবারকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন, স্থানীয় মানসিকতা ছিল। পুরনো সেই মনোভাবের সাথে আজ ‘দেশ’ বলতে যে ব্যাপক মনোভাবকে বোঝায় তার কোনও মিল নেই। দেশে যখন রেনেসাঁসের জাগরণ শুরু হল— রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল পর্যন্ত এই যে ধারাবাহিকতা— এতে দেশের যুবকদের সামনে একটা নতুন নৈতিকতা, একটা নতুন আদর্শবাদ, ‘দেশ’ সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা ও চেতনা, সমাজ সম্বন্ধে একটা নতুন চেতনা— এককথায় একটা নতুন আদর্শ, নৈতিকতার ধারণা সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল। পুরনো প্রচলিত আদর্শ ও নৈতিকতা, নীতিবোধের ধ্যানধারণাকে লড়াই করে পরাস্ত করে দিয়ে যুব মনে যে নতুন আদর্শ ও নীতিবোধ প্রভাব বিস্তার করতে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল— তা ভারতবর্ষে একটি নতুন জাগ্রত মানবতাবোধের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিকতা বা স্বাধীনতা বা দেশাত্মবোধের চেতনা। তা হলে, আদর্শই সেদিন এই চেতনা, এই নৈতিকতা, এই মূল্যবোধ সমাজের মধ্যে এনেছিল। পুরনো আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তা যখন সমাজের মানসিকতাকে অধিকার করতে, তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তখনই তার আবর্তে আবর্তিত হয়ে দেশের যুবসম্প্রদায় পাগলের মতো ছুটেছে নতুনের সন্ধানে। মানুষের দৃষ্টিকোণ পাল্টে গেছে, কূপমণ্ডুকতা কেটে গেছে, মানুষ স্বাধীনতার কথা ভাবতে শিখেছে, জাতির ‘কনসেপশন’ (ধারণা) পাল্টে গেছে, দেশ সম্বন্ধে ‘লোকালাইজড’ (অঞ্চলভিত্তিক) ধারণা পাল্টে গেছে, পরিবার সম্বন্ধে কূপমণ্ডুক ধারণা পাল্টে গেছে। এগুলো পাল্টে গিয়ে মানুষ সামাজিক হয়েছে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু, আপনাদের মনে রাখতে হবে, সেই আদর্শবাদ ছিল মূলত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং তারই ভিত্তিতে তার গণতান্ত্রিক চেতনা— বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণিচেতনা। এই বুর্জোয়াশ্রেণির গণতন্ত্রের চেতনা এবং স্বাধীনতার ধ্যানধারণা, দেশাত্মবোধের ধ্যানধারণার উপরই মূলত সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্যানধারণা হলেও সেদিন তা ছিল বিপ্লবাত্মক, তা ছিল প্রগতিশীল। তাই সেদিন সেই আদর্শবাদের ঝান্ডা

নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়তে গিয়েছেন, ‘দেশের স্বাধীনতায় আমার জন্মগত অধিকার’— এই কথাটুকু যাঁরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হোক, কাব্যের মধ্য দিয়ে হোক, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হোক, যেভাবেই হোক বলেছেন— তার জন্য তাঁদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, তার জন্য তাঁদের কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অপরিসীম। সে পথ ছিল দুঃখের পথ, কষ্টের পথ, সংগ্রামের পথ। সে কষ্টের মধ্যে, সে সংগ্রামের মধ্যেই ছিল আনন্দের রূপ। তা নির্জীব, নির্বীর্য, জড় পদার্থের ও ক্লীবের আনন্দ ছিল না।

কিন্তু, স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। তার ফলে সমাজের মৌলিক সমস্যা, অর্থাৎ গণমুক্তি আন্দোলন সফল হতে পারল না, গণমুক্তির মূল প্রশ্নটির সমাধান হতে পারল না। এমনকী রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ ‘ন্যাশনালিটি’গুলোকে (খণ্ড-জাতিগুলোকে) নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ হলেও বিভিন্ন অংশের জনগণের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থেই, বুর্জোয়া জাতীয়তার অর্থেই যে ঐক্যবদ্ধতা, তা পর্যন্ত এদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। দেশের জনসাধারণ ‘রেস’কে (জাতিকে) ভিত্তি করে, ধর্মকে ভিত্তি করে, ‘কাস্ট’কে(বর্ণকে) ভিত্তি করে বিভক্ত হয়ে রইল। ...

এর কারণ এ দেশের মূল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিভূরা। যেহেতু ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিশ্রেণি বিশ্বপুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগোষ্ঠীরই অংশীদার, সেহেতু এ যুগে তার মধ্যে আগের সেই পুরনো বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর ছিল না। স্বাধীনতা তাদের দরকার ছিল, কিন্তু বিপ্লব তাদের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতা বলতে তাদের প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশের হাত থেকে শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রটা কেড়ে নেওয়া। বিপ্লবের আঘাতে গোটা সমাজটাকে পাল্টে সমাজের আধুনিকীকরণ করা— এ তাদের প্রয়োজন ছিল না। ...

...‘আদর্শের জন্য মানুষ’ নয়— সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, প্রগতির জন্য আদর্শ। আদর্শের জন্ম হচ্ছে একদিকে মানুষের মননশীলতার সাথে প্রকৃতির প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে ব্যক্তিসত্তার সাথে তার সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে, এবং এই অর্থে আদর্শের স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। হঠাৎ একটা আদর্শ কোথাও থেকে এসেছে, আর তারপর মানুষের মস্তিষ্ক সেটাকে নিয়ে চলেছে— এইভাবে আদর্শের জন্ম হয়নি। সমাজের অভ্যন্তরে প্রগতির জন্য, বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে মননশীলতার সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে ভাবজগতের জন্ম। এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, মানুষের মস্তিষ্ক ও প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বাঁচার তাগিদে উৎপাদনের প্রয়োজনেই মানুষের মধ্যে প্রথম সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটে এবং মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। তাই মানুষের জীবনও যেমন পাল্টাচ্ছে, প্রকৃতি যেমন পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে— তেমনি মানুষ এবং প্রকৃতির সংঘর্ষের রূপও পাল্টাচ্ছে, তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আবার সমাজের সমস্যাগুলির রূপও পাল্টাচ্ছে। ফলে, আদর্শ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। আদর্শও পাল্টাতে বাধ্য। তাই সমস্ত আদর্শ বা আদর্শবাদেরই জন্ম-মৃত্যুর একটা ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস আছে। শাশ্বত আদর্শ, শাশ্বত নীতি, অপরিবর্তনীয় শাশ্বত মূল্যবোধ— এসব মিষ্টি কথা, কিন্তু মিষ্টি বাজে কথা, কাজের কথা নয়। বড় মানুষের মুখ দিয়ে বেরোয় বলেই কোন আদর্শ শাশ্বতসত্য হয়ে যায় না। কারণ, বড় মানুষের চিন্তাও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ব্রহ্মার বরপুত্র নন! তিনি সামাজিক জীব। সমাজের আভ্যন্তরীণ আলোড়নে, সমস্ত সংঘর্ষের আলোড়নে, মানুষ ও প্রকৃতির সংঘর্ষের আলোড়নেই তাঁর চিন্তা আবর্তিত। এই দুই সংঘর্ষের আবর্তে যে কোনও বড় মানুষ আবর্তিত। তার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা কারুর নেই। তাই মার্কস বলেছেন যে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ‘প্রোডাকশন-রিলেশন’ (উৎপাদন সম্পর্ক)। অনেকে মার্কসের এই উক্তিকে সংকীর্ণ অর্থকরী সম্পর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তা ভুল। ‘প্রোডাকশন’ (উৎপাদন) বলতে তিনি ‘স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন’ (ভাবগত উৎপাদন) এবং ‘মেটিরিয়াল প্রোডাকশন’ (বস্তুগত উৎপাদন)— দুটোই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মূল্যবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন, ‘জুরিসপ্রুডেন্স’ (বিচারশাস্ত্র)— এগুলো হচ্ছে ‘স্পিরিচুয়াল প্রোডাকশন অব হিউম্যান বিয়িং’ (মানুষের ভাবগত উৎপাদন)। আর, মেটিরিয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন হয় এবং আমরা যা ভোগ করি। সাথে সাথে মার্কস বলেছেন, এই বস্তুগত উৎপাদনকে যে শ্রেণি ‘কন্ট্রোল’ (নিয়ন্ত্রণ) করে, ভাবগত উৎপাদনকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সমাজের বস্তুগত উৎপাদনটা যে শ্রেণির হাতে, যার নিয়ন্ত্রণে, যার আধিপত্যে— সমাজে ভাবগত উৎপাদন, অর্থাৎ সমাজের গোটা মানসিকতাকেও তারাই মূলত প্রভাবিত করে। এখানে মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে বিরুদ্ধ শক্তিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা সে যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা— যা কোনও একটা ‘গিভেন’ (বিশেষ) শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রচলিত, তা যতদিন ধরেই প্রচলিত থাক না কেন, যেভাবেই মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করুক না কেন— তার সঠিকতা— তার চরিত্র প্রগতিশীল, না প্রতিক্রিয়াশীল— তা আমাদের উপকার করবে, না সমাজপ্রগতিতে আজ বাধা সৃষ্টি করবে— এ বিচার সবসময়ই করতে হয়। আর, এ বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় যে, এই মূল্যবোধ কোন বিশেষ ধরনের ‘প্রোডাকশন সিস্টেম’ (উৎপাদন ব্যবস্থার) অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ‘সুপারস্ট্রাকচার’ (উপরিকাঠামো)। সমাজ যখন শ্রেণিবিভক্ত হয়নি, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা যখন ব্যক্তিগত বা শ্রেণির অধিকারে যায়নি, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনেই যখন উৎপাদন হত, তখন সমাজচিন্তাও শ্রেণিবিভক্ত হয়নি। কিন্তু, যখন থেকে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে তখন থেকে

সাতের পাতায় দেখুন

‘আসল শক্তি জনগণের মধ্যেই নিহিত’

নন্দীগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন র‍্যামসে ক্লার্ক

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে ২০০৭ সালের ২৭-২৯ নভেম্বর কলকাতায় যে মিছিল ও দু’দিন ব্যাপী সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল, তাতে উপস্থিত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা, আমেরিকার ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারে’র প্রেসিডেন্ট ও প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক। নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখতে ২৯ নভেম্বর তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে মহাজাতি সদনে উপস্থিত হয়ে নন্দীগ্রামে জনসাধারণের সংগ্রামের তাৎপর্য সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তিনি পেশ করেন। বক্তব্যটি গণদাবীর ৬০ বর্ষ ১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। র‍্যামসে ক্লার্কের জীবনাবসানে তাঁর এই বক্তব্যটি পুনরায় প্রকাশ করা হল।

নন্দীগ্রাম এক হৃদয়মথিত করা অভিজ্ঞতা, এক প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতাও বটে। আজ গোটা পৃথিবীর মানুষ যে সংকটের সম্মুখীন, নন্দীগ্রামের ঘটনা তারই এক খণ্ডচিত্র। নিজের চোখে না দেখলে, শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ পড়ে এর সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। দেড় হাজার বছর ধরে পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জমিতে বাস করে আসছে যে জনসাধারণ— আজ তাদের নিজেদের সরকারই তাদের হত্যা করেছে, আহত করেছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। নন্দীগ্রামের একটা অংশে ১১৯টি বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমরা বহু ভস্মীভূত বাড়ি দেখেছি; যাঁরা এই সব ঘরে বাস করতেন, কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি; এঁদের সম্পত্তি লুঠপাট করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ, অনেকেই আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। একটি ছোট ছেলে, তার কপালে গুলি লেগেছিল, আমি বুলেটের সেই ক্ষত দেখেছি। ছেলেটি উঠে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কথা বলতে পারে কি না, আমি বুঝতে পারিনি। এই ছোট ছেলেটি মারাত্মকভাবে আহত অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন মাত্র। মৃতের সংখ্যা যা বলা হচ্ছে, স্পষ্টতই তার চেয়ে অনেক বেশি। একটা ছোট জায়গাতেই ১০০ জন মারা গেছে বলে এলাকার মানুষ নিশ্চিত ভাবে জানিয়েছেন।

বিধ্বস্ত নন্দীগ্রামে সর্বস্ব হারানো মানুষদের পাশে র‍্যামসে ক্লার্ক

কেন এই সরকার সাধারণ মানুষের ওপর এই অত্যাচার চালাচ্ছে? এ জিনিস তারা করছে, যাতে ধনী ও শক্তিশালী বিদেশি কায়েমি স্বার্থবাদীরা এদেশে এসে শুধু ভারতীয়দের নয়, গোটা বিশ্বের মানুষকে শোষণ করতে পারে। যে ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ স্থাপন করার আশায় তারা পরিকল্পনা তৈরি করছে, সেখানে আপনারা রাসায়নিক কারখানা দেখতে পাবেন, হয়ত ‘ডাও কেমিকেল’-এর দেখাও পেতে পারেন। ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনার পরেও ডাও কেমিকেল এদেশে ফিরে আসছে— একথা কি কল্পনাও করা যায়! অথচ, পরিবেশ দূষিত করে সর্বত্র জীবন বিপন্ন করে তুলতে এবং সম্পদ শোষণ করার লক্ষ্যে এ জিনিসেরই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমাদের বলা হয়েছে, সেখানে যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈরির কারখানা গড়ারও পরিকল্পনা আছে। এই যুদ্ধাস্ত্র ইরাকিদের হত্যা করার জন্যই কি তৈরি হবে? কোন দেশের মানুষের ওপর আক্রমণ চালানো হবে এইসব অস্ত্র দিয়ে?

সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রা রুখতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে কীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে, তা নন্দীগ্রামের ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেখানকার মানুষ ঘরবাড়ি-স্বজন সহ সর্বস্ব হারিয়ে আজ সর্বস্বান্ত। তাদের এই দুর্দশা করা হল যাতে পুঁজি এসে সমস্ত পরিবেশকে বিষিয়ে তুলতে পারে এবং মুষ্টিমেয় মানুষ ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে গোটা মানবসমাজের অধিকাংশকে ক্রমেই আরও দরিদ্র করে তুলতে পারে।

নন্দীগ্রামের মানুষ কী অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছে— সে-কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই মুহূর্তে নিজেদের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির বিনিময়ে এক মহাশক্তিকে তারা স্পর্ধাভরে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু তারা বলছে, আমাদের সাহায্য ছাড়া একাজ তারা সফল করতে পারবে না। আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে না পৌঁছতে পারলে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে না পারলে আমরাও এ জিনিস প্রতিরোধ করতে পারব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন নাগরিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন হয়েছিল, নিপীড়িত আফ্রো-মার্কিন জনসাধারণ তখন দাবি তুলেছিল — ‘জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে’। প্রমাণ হয়ে গেছে, সে কথা ভুল ছিল। বস্তুত জনগণই শক্তির উৎস — এই স্বতঃসিদ্ধকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রশ্ন হল, নিজেদের এই শক্তিকে প্রয়োগ করার মানসিক জোর এবং বুদ্ধিমত্তা জনসাধারণের আছে কি না। জনগণকে কে অগ্রাহ্য করতে পারে! ইরানের শাহকে সেদেশের জনসাধারণই অহিংস উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এই শাহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। ১৯৭২-৭৬ সালের মধ্যে শাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার জন্য ২৬০০ কোটি ডলার খরচ করেছিল; ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি সংখ্যক যুদ্ধট্যাঙ্কের মালিক ছিল সে। এতসব কিছু থাকা সত্ত্বেও তাকে একদিন সরে যেতে হয়েছিল, কারণ সমস্ত মানুষকে সে হত্যা করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল সেদিন রাজপথ দখল করেছিল। তারা কলকারখানা, বাজার সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছিল, স্কুল-কলেজ-অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন থেকে তারা দলে দলে বেরিয়ে এসেছিল। গোটা দেশকে তারা স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং শাসকদের প্লেনে চড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের চ্যালেঞ্জ হল, সকলকে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা।

আমার মনে হয়, বহু বিষয়কে একত্র করে নন্দীগ্রাম যে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে, তা সচরাচর দেখা যাবে না। নন্দীগ্রামের সংগ্রাম এমন একটি কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যারা নিজের সমৃদ্ধির জন্য মানুষ ও দেশকে ধ্বংস করে, তাদের সর্বস্বান্ত করে। আমরা সর্বত্র নন্দীগ্রামের মানুষের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে যাব। এ শুধু তাদের সাহায্য করার জন্য নয়; সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই একাজ আমাদের করতে হবে। কারণ, বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদ যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, অতীতে তা কখনও দেখা যায়নি।

ঠিক এই কারণেই, এদেশে যেসব ভাল মানুষেরা ‘অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম’ গড়ে তুলেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অনেক। আমি সর্বদা ‘অল ইন্ডিয়া’ কথাটি বলতেই ভালবাসি এবং আশা করি, সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধিতায় সারা ভারতের মানুষই একজোট হবে। আমি আরও আশা করি, এই সম্মেলনের শেষে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মশক্তি, অঙ্গীকার এবং কার্যকলাপের ঐক্য গড়ে তোলার পথ খুঁজে পাব। এই পথ ধরেই আমরা জয়ী হব।

র‍্যামসে ক্লার্কের জীবনাবসান

একের পাতার পর

নিয়ে সরব ছিলেন। পরে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং হ্যানয়ে মার্কিন বোমাবর্ষণের প্রতিবাদ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই হল যুদ্ধের প্রধান হোতা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ-আগ্রাসন চালানোর মুখ্য অপরাধী। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আগ্রাসনের বিরোধিতায় তিনি সরব হয়েছেন এবং মার্কিন একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকলকে সমর্থন করেছেন। ১৯৯১ সালে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের শুরু করা উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ায় ন্যাটোর বোমাবর্ষণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ২০০৩-এ জর্জ ডব্লিউ বুশের ইরাক যুদ্ধেরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। ইরাকের বিশেষ ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের বিচারকে তিনি বেআইনি ও মানবাধিকার লংঘনকারী হিসাবে অভিহিত করেন। এই ট্রাইবুনালে তিনি সাদ্দাম হুসেনের আইনজীবী হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে বিচারের নামে কেমন প্রহসন হয়েছিল তা তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন। যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিচারটিকেও তিনি অন্যায় বলে সমালোচনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে তিনি শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অত্যন্ত সাহসী এক সেনাপতি হিসাবে বর্ণনা করেন। বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করতে এবং অন্য দেশের ওপর যে কোনও দেশের সামরিক আগ্রাসনের ঘটনার বিরোধিতা করতে তিনি গড়ে তোলেন ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার’ নামক সংগঠন। যুদ্ধাপরাধ, শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং মার্কিন নাগরিক ও যে সব দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসন চালিয়েছে সেখানকার নাগরিকদের নাগরিক অধিকার খর্ব করার অপরাধে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বাক্ষর সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ নেন।

র‍্যামসে ক্লার্ক ২০০৭-এর নভেম্বরে ভারতে এসেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাবেশে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সেই সমাবেশ থেকে ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট কোঅর্ডিনেটিং কমিটি’ নামক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়, যার সভাপতি নির্বাচিত হন র‍্যামসে ক্লার্ক। সেই বছর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত সরকারের পুলিশ দলীয় সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে সরকার কর্তৃক জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত গ্রামবাসীর ওপর অমানবিক আক্রমণ চালায়। সরকারি হিসাবে সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৪ জনের, শত শত মানুষ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, মহিলারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। নভেম্বর মাসেও সেখানে মারাত্মক আক্রমণ চালায় সিপিএম। কলকাতায় থাকার সময়ে র‍্যামসে ক্লার্ক নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানকার ধ্বংসলীলা দেখে, এলাকার আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাদের ওপরে ঘটনা অত্যাচারের বর্ণনা শুনে তিনি প্রবল ভাবে আলোড়িত হন। সিপিএম পরিচালিত সরকারের এই নির্মম পাশবিকতা, পুলিশি বর্বরতা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে র‍্যামসে ক্লার্ক সিপিএম পরিচালিত তৎকালীন সরকারের নিন্দায় ছিলেন দ্ব্যর্থহীন। বস্তুত, পৃথিবীর যেখানেই মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে, কোনও দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হেনেছে সাম্রাজ্যবাদীরা, সেখানেই ন্যায়বিচারের সংগ্রামে প্রতিবাদের সামনের সারিতে থেকেছেন র‍্যামসে ক্লার্ক।

তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এবং মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ও সুযোগ্য নেতাকে হারাল। অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এই সংগ্রামী যোদ্ধার স্মৃতিতে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর অপূরিত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করছে।

আমেরিকায় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি গিলে খেয়েছে ছোট চাষিদের

বিজেপির কৃষি আইনে ভারতে এটাই ঘটবে

নতুন কৃষি আইন এনে বিজেপি সরকার এ দেশে আজ যা করতে চাইছে ৪০ বছর আগে সেটাই করা হয়েছিল আমেরিকায়। আমেরিকার সরকার কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের সামনে হাট করে খুলে দিয়েছিল কৃষিক্ষেত্রের দরজা। কী হয়েছে তার পরিণতি? কেমন আছেন বিপুল সংখ্যক মার্কিন ছোট চাষি? খতিয়ে দেখতে গত জানুয়ারিতে আমেরিকার ১০ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ অঞ্চল সফর করেছেন লস এঞ্জেলেসের বাসিন্দা আইআইটি-প্রাক্তনী, নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানী জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফিল্ম পরিচালক বেদব্রত পাইন ও তাঁর তিন সহযোগী। ৮ মার্চ টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের লিখিত অভিজ্ঞতা, গা শিউরে ওঠা ছবি।

ছোট চাষিদের জীবনে আজ শুধুই অন্ধকার

ভারতের মতোই আমেরিকাতেও ছোট চাষির সংখ্যাই বেশি। মোট কৃষক সংখ্যার ৯০ শতাংশই ছোট চাষি। কিন্তু ফসল বিক্রি করে দেশের মোট যে আয় হয়, তার মাত্র ২৫ শতাংশের দাবিদার তাঁরা। আমেরিকার গ্রামীণ জীবনের সংকটের চেহারা বুঝতে এই পরিসংখ্যানটুকুই যথেষ্ট। সে দেশে গত কয়েক দশক ধরে ছোট চাষিদের আয় ক্রমাগত কমেই চলেছে। ২০ বছরে আমেরিকায় গম চাষের খরচ বেড়েছে তিন গুণ। অথচ বিক্রির সময় ছোট চাষির জোটে সেই ১৮৫৬ সালের গৃহযুদ্ধের সময়কার মতো যৎসামান্য দাম। স্বাভাবিক ভাবেই ধারদেনায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছে মার্কিন ছোট চাষিদের। তাঁদের মোট ঋণের পরিমাণ সাড়ে ৪২ হাজার কোটি ডলার ছুঁয়েছে। বেড়ে চলেছে ব্যাঙ্কের ধার শোধ করতে না পারা ‘দেউলিয়া’ চাষির সংখ্যাও। সমাধানের দিশা খুঁজে না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন নিরুপায় মানুষগুলি। দিনে দিনে দীর্ঘ হচ্ছে আত্মঘাতী চাষির মিছিল। সাহায্য চেয়ে মনোবিদের চেম্বারে ভিড় করছেন চরম হতাশাগ্রস্ত এই চাষিরা। আত্মহত্যা করেছেন স্থানীয় এক ব্যাঙ্ককর্মীও। নিঃস্ব হয়ে পড়া ছোট চাষিদের কাছ থেকে ধারের টাকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিল ব্যাঙ্ক। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের অসহায় জীবনযন্ত্রণা মেনে নিতে পারেননি তিনি।

মার্কিন গ্রামগুলি আজ প্রায় জনমানবহীন। ছোট চাষ প্রায় বন্ধ। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোটখাট গ্রামীণ ব্যবসাপত্রও। বন্ধ হয়ে পড়ে থাকছে বীজের দোকান, শস্য রাখার শূন্য গোলাঘর, কৃষি-যন্ত্রপাতি সারাইয়ের ছোট কারখানা এমনকি স্থানীয় হাসপাতালগুলিও। প্রতি বছরই আমেরিকার গ্রামগুলিতে প্রায় হাজারখানেক করে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর অভাবে। সব মিলিয়ে চরম দারিদ্র ও দুর্দশা গ্রাস করেছে গ্রামীণ আমেরিকার আকাশ।

দায় কার

গ্রামসফরে গিয়ে ছোট চাষিদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন সমীক্ষকরা। প্রত্যেকেই বলেছেন, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের হাত ধরে মার্কিন ছোট চাষিদের দুর্দশার শুরু। মার্কিন কৃষিতে বৃহৎ কৃষি-ব্যবসায়ী বড় পুঁজির মালিকদের অবাধ প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রেগান। ছোট চাষিদের জীবন-জীবিকা উচ্ছেদ করে হাতে-গোনা বড় কৃষি-ব্যবসায়ীরাই আজ মার্কিন কৃষিক্ষেত্রের প্রায় পুরোটা দখল করে নিয়েছে।

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট হন বিনিয়ন্ত্রণ ও অবাধ বাণিজ্যের অন্যতম প্রবক্তা রেগান। যাবতীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে দেশের কৃষি-অর্থনীতির দরজা তিনি হাট করে খুলে দিয়েছিলেন বড় পুঁজির মালিকদের সামনে। নতুন কৃষি আইনে চাষি ও সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধা হবে বলে নরেন্দ্র মোদি যেভাবে ঢাক পেটাচ্ছেন, ঠিক তেমন ভাবেই কৃষিকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার সুফল নিয়ে ব্যাপক প্রচার করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রেগান।

১৯২৯ সালের বিশ্বজোড়া মহামন্দা থেকে বাঁচতে কৃষি-ফসলের দামে সরকারি ভরতুকি, কম সুদে কৃষিঋণের ব্যবস্থা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ধাঁচে ‘প্যারিটি প্রাইসিং’ ইত্যাদি যে সব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল আমেরিকায়, বিনিয়ন্ত্রণের পথে হেঁটে ধীরে ধীরে সে সব তুলে নেওয়া হল। এরই মধ্যে ২০০৮ নাগাদ আবার বিশ্ব জুড়ে আঘাত হানে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক মন্দা। ফসল বিক্রি করতে গিয়ে আমেরিকার ছোট চাষিরা হঠাৎ দেখলেন, দাম ব্যাপক কমে গেছে। পাশাপাশি কমে যায় জমির মূল্য এবং ব্যাপক চড়ে যায় সুদের হার। সরকারি সহায়তা হারিয়ে বন্ধ হয়ে যায় আড়াই লক্ষ ছোট কৃষিক্ষেত্র। ১০ লাখেরও বেশি চাষি পরিবার, চাষবাসই বংশানুক্রমে যাঁদের পেশা, বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েন। আমেরিকার মানচিত্রে এখন জনমানবহীন অসংখ্য গ্রামের ভিড়।

সর্বনাশা চুক্তিচাষ

পুঁজির নিয়মেই ধীরে ধীরে গ্রামীণ আমেরিকায় চাষের জমির অধিকাংশই চলে গেছে বড় কৃষি-ব্যবসায়ীদের গ্রাসে। জমিহারা অসংখ্য মার্কিন চাষি এখন চুক্তিচাষের কড়া শর্ত মেনে কৃষি-ব্যবসায়ীদের অধীনে হাড়ভাঙা খাটনি খেটে দু’মুঠো খাবারের বন্দোবস্ত করছেন। এখন হাতে গোনা কয়েকটি বৃহৎ কৃষি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকার কৃষিপণ্যের গোটা বাজারটা। নিতান্ত অল্প সংখ্যক যেসব ছোট চাষি এখনও চাষের কাজে যুক্ত আছেন, নেহাত অল্প দামে তাদের ফসল কিনে নিচ্ছে বড় কোম্পানিগুলি। কৃষিক্ষেত্রের গোটা পরিকাঠামোটাই এখন বড় ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোয়। চাষের খরচ তারা এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে ছোট চাষিরা কোনও মতেই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না।

আমেরিকার কৃষি চিত্রনাট্যে এক ট্র্যাজিক চরিত্র জিম গুডম্যান। সমীক্ষকরা কথা বলেছেন তাঁর সঙ্গে। গো-পালনের কাজটিকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন গুডম্যান। নিজের ডেয়ারি ফার্মের ৪৫টি গোরুর প্রতিটিকে আলাদা করে চিনতেন, নাম জানতেন। ফার্মটিকে বাঁচিয়ে রাখতে ৪০ বছর ধরে বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গোরুগুলি বিক্রি করে দিয়ে ডেয়ারি ফার্মটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন গুডম্যান। এমনই এক গো-পালক জোয়েল গ্রিনো এখন একটি কারখানায় ১২ ঘন্টার দিনমজুরি করেন। ছোট চাষিদের একটা বড় অংশ ভাগচাষি হয়ে গেছেন। ট্রাক্টর ভাড়া করে চাষ করতে হয় তাঁদের। এঁদেরই একজন ধারের কিস্তি শোধ করতে পারেননি বলে মরশুমের মাঝখানে কোম্পানি নিয়ে চলে গেছে তাঁর ট্রাক্টরটি। এখন তিনি অথৈ জলে।

দুর্গতিতে পশুপালকরাও

শুধু ছোট চাষিরাই নয়, আমেরিকার পশুপালক মানুষগুলিও আজ চরম দুর্দশায়। বড় কোম্পানির মালিকরা জোট বেঁধে কেমন করে বন্ধ করতে বাধ্য করেছে মাইক ক্যালিফ্রেটের পশুখামার, সেই করুণ কাহিনী সমীক্ষকদের শুনিয়েছেন তিনি। আমেরিকায় এখন হাতে গোনা কয়েকটি বড় কোম্পানি গোটা পশুমাংসের বাজার কব্জা করে নিয়েছে। মুরগি, গোরু কিংবা শুয়োর চাষিরা এখন ঠিক যেন সেইসব কোম্পানির ক্রীতদাস। চুক্তির ভিত্তিতে কোম্পানির বেঁধে দেওয়া দামে কোম্পানির হয়ে পশুপাখি পালন করেন এঁরা। একসময়ে যাঁরা ছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়ী, আজ তাঁরা মালিকের অধীনস্থ— দরদাম করার উপায় পর্যন্ত নেই তাঁদের।

বর্তমানে আমেরিকার ৭৫ শতাংশ মুরগিপালক রয়েছেন দারিদ্রসীমার নিচে। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় এখন হাতে গোনা বৃহৎ কৃষি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। বীজ ব্যবসার তিনভাগের দু’ভাগ, রাসায়নিক সার ব্যবসার ৮০ শতাংশ, শস্য বিক্রি, ডেয়ারি-পণ্য ও মাংস উৎপাদন এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই এখন মাত্র চারটে বড় একচেটিয়া কৃষি-কোম্পানির দখলে।

কৃষি-কোম্পানির মাথায় সরকারি আশীর্বাদের হাত

বড় পুঁজির মালিক এইসব কৃষি কোম্পানিগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মোদি সরকারের সঙ্গে অদ্ভুত মিল মার্কিন সরকারের। ঠিক আমাদের দেশের মতোই আমেরিকার সরকারও বড় পুঁজির এই মালিকদের দিকে দেদার অর্থসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুবিধা, ঋণে বিপুল ছাড়, ফসল বিমা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কৃষি কোম্পানিগুলির মুনাফার বিশ্বস্ত পাহারাদারের ভূমিকা চমৎকার ভাবে পালন করে চলেছে মার্কিন সরকার। ছোট চাষিদের জীবন অন্ধকারে ভরে যায় যাক, মার্কিন সরকার ভরতুকির ৫ হাজার কোটি ডলারের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঢেলে দেয় কৃষি-ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির ওপরতলার ২০ শতাংশের পায়ে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, শাসক দলগুলির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে এর পিছনে। কৃষিপণ্যের উৎপাদক ও ক্রেতা, উভয়েরই কল্যাণ হবে— এই ধুয়া তুলে প্রেসিডেন্ট রেগান একচেটিয়া কারবারিদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন। বলেছিলেন, “ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের অনুমতি দিতে চলেছি আমরা। কারণ, এর ফলে দক্ষতা বাড়বে...। জিনিসপত্রের দাম কমাতে এঁরা (একচেটিয়া কারবারিরা) এর সুযোগ নিতে চলেছেন।” মাঝে মাঝে ঠিক এমনই সুরে ভারতের বৃহৎ শিল্পপতিদের গুণকীর্তন শোনা যায় না নরেন্দ্র মোদিদের গলায়?

গ্রামীণ আমেরিকা আজ ধুলোয় লুটাচ্ছে

একচেটিয়া কারবারের রমরমা হয়েছে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রেগানের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী খাদ্যপণ্যের দাম কি কমেছে সেখানে? একেবারেই না। বরং দেখা যাচ্ছে গত ৪০ বছরে আমেরিকায় খাদ্যপণ্যের গড় দাম ২০০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বিপরীতে, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মার্কিন নাগরিকদের ৯০ শতাংশের রোজগার বেড়েছে খুব বেশি হলে মাত্র ২৫ শতাংশের মতো, যাকে মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে বৃদ্ধি বলা চলে না।

গোটা কৃষিক্ষেত্রটি বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে দেশের অসংখ্য খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষকে পথে বসিয়েছে মার্কিন সরকার। গ্রামীণ আমেরিকার মানুষ আজ চূড়ান্ত গরিবিতে ধুঁকছে। বেড়েছে খেতে-না-পাওয়া শিশু ও অনাহারী পরিবারের সংখ্যা। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরগুলির তাক-লাগানো চাকচিক্যের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত দুর্দশাগ্রস্ত অন্ধকার গ্রামগুলি। বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির মুনাফার নির্মম ফাঁসে দম বন্ধ হয়ে আজ ছটফট করছে গ্রামীণ আমেরিকা।

অনেকে প্রশ্ন করেন, আমাদের দেশের চাষিরা নতুন কৃষি আইনগুলি প্রতিরোধে দিল্লিতে এভাবে মরণপণ আন্দোলনে মাসের পর মাস ধরে অনড় রয়েছেন কেন। আসলে আমেরিকার পথ অনুসরণ করে নরেন্দ্র মোদি সরকার আম্বানি-আদানিদের সামনে রেখে ভারতেও যে এ জিনিস করতে চায়, সে কথা ধরে ফেলেছেন দেশের কৃষিজীবী মানুষ। নতুন কৃষি আইনগুলি চালু হলে তাঁদেরও যে আমেরিকার ছোট চাষিদের মতো চূড়ান্ত দুরবস্থায় পড়তে হবে— বুঝে ফেলেছেন তাঁরা। তাই তাঁরা বদ্ধপরিকর, কোনও মতেই আম্বানি-আদানিদের মতো বৃহৎ পুঁজিপতিদের গিলে খেতে দেবেন না ভারতের কৃষিক্ষেত্রটিকে, আমেরিকার চাষিদের মতো ভারতের চাষিদেরও ছুঁড়ে ফেলতে দেবেন না সর্বনাশের অতল গহ্বরে। হাজারো বাধা বিপত্তি আসুক, সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যতই আন্দোলন ভাঙার অপচেষ্টা চালাক, কৃষি আইনগুলি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বেন না তাঁরা— এই তাঁদের অঙ্গীকার। দেশের মানুষকে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে সংগ্রামরত এই মানুষগুলির পাশে।

পাঠকের মতামত

নন্দীগ্রামের সত্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির ন্যক্করজনক মন্তব্য প্রচারমাধ্যমে আসছে। ঐতিহাসিক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে এবং নিজেদের অপকীর্তি ঢাকতে এই সুযোগে সিপিএম কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েছে। তাদের ভাবভঙ্গি এমন যেন এই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম গণআন্দোলনের ফলে রাজ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। তাদের বক্তব্য, বেকার সমস্যা মেটাতে যে শিল্পায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার, তা বন্ধ হয়ে যায় এই গণআন্দোলনের ফলে যা বাংলার চরম ক্ষতি করেছে এবং এই আন্দোলন না হলে বাংলায় বেকার সমস্যা থাকত না এবং শিল্পায়নের জোয়ার বয়ে যেত। সত্যিই কি তাই?

১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত, বিশেষ করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা যাক ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জুট শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের জুটমিলের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬২টি, যার মধ্যে বহু কারখানা পূর্বতন সিপিআই(এম)-ফ্রন্ট সরকারের আমলেই বন্ধ হয়ে যায়, কিছু কারখানা ধুঁকতে থাকে। কানোরিয়া জুট মিল, নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হুগলি নদীর দুই পাড়ে গড়ে উঠেছিল জুট মিল সহ অসংখ্য ভারী ও মাঝারি শিল্প যার অধিকাংশ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের বহু আগেই বন্ধ হয়ে যায়। বাউড়িয়া কটন মিল, বজবজ অঞ্চলের বিড়লাপুরের বিড়লা পাওয়ার প্লান্ট, কার্বাইড ফ্যাক্টরি, উল কারখানা বন্ধ হয়ে কর্মহীন হয়ে যান হাজার হাজার শ্রমিক, যাদের বড় অংশ প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দমোটরের দুরবস্থাও বহুদিনের। বর্তমান সময়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের দাবি ন্যূনতম বেতন ১৮০০০-২১০০০ টাকার। কিন্তু সিপিএম ক্ষমতায় থাকার সময়ে জুট মিলের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিয়ে আসে কালা আইন যার মধ্য দিয়ে তারা ন্যূনতম দৈনিক মজুরি করে মাত্র ১০০ টাকা। দীর্ঘদিন এক গোপন আঁতাতের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য ডিএ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এই হল তৎকালীন সময়ের (২০১১ সালের পূর্বে) শিল্প ও শ্রমিকদের দুরবস্থা।

এবার দেখা যাক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্পপতিদের আগমন ও জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে। নন্দীগ্রামে ২০০৫ সাল নাগাদ কেমিক্যাল হাব গড়ে তুলতে ইন্দোনেশিয়ার পুঁজিপতি সালেম গোষ্ঠীর জন্য যে প্রায় ১৯ হাজার একরের বেশি জমি অধিগ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল (সিপিএমের এক জনসভায় ঘোষণা করা হয় সাড়ে ১৪ হাজার একর জমি), তা যদি বাস্তবায়ন হত তা হলে যেমন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ হাজার হাজার পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যেত, তেমনি কেমিক্যাল হাবের বর্জ্যে খাল-বিল-নদীর জল, জমি সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পরিবেশ দূষিত হত, মাছ-কাঁকড়া সহ বিভিন্ন জলজ জীবকূলের ভারসাম্য নষ্ট হত এবং এর প্রভাবে কয়েক হাজার জনসাধারণের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে যেত। একই অবস্থা সিঙ্গুরের ক্ষেত্রেও। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জমি (কৃষি জমি) অধিগ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল। যেখানে দেশের মোট জমির মাত্র ১৮ শতাংশ (প্রায়) কৃষিজমি সেখানে শিল্পের নামে এই ভাবে জমি কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা।

সিঙ্গুর এবং বিশেষ করে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল কিংবা একজন নেতা বা নেত্রীকে কোনও ভাবেই পেটেন্ট দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও বলা চলে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রকৃত অর্থে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন, বর্তমান সময়ের কৃষি আইন বিরোধী গণআন্দোলনের মতো। নন্দীগ্রামে এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে দলমত নির্বিশেষে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি', এই কমিটিতে এসইউসিআই(সি) সহ বেশ কিছু সংগঠন ও তৎকালীন শাসক দলের নিচুতলার কর্মী সমর্থকরা, যারা শঙ্কিত ছিলেন জমি হারাবার ভয়ে— সকলেই ছিলেন। একই ভাবে সিঙ্গুরের ক্ষেত্রেও জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নামে এলাকার সংগ্রামী কৃষক রমণী সহ জনসাধারণ। এলাকার গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মহিলা ও ছাত্রযুবদের নিয়ে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সংগ্রাম কমিটি প্রভৃতি। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম গণআন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন সমাজের বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংস্কৃতিক কর্মী-অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-শিক্ষক-শিক্ষিকা-নাট্যকর্মী এবং সর্বোপরি ছাত্র ও যুব সমাজ। কবি তরুণ সান্যালের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। যাতে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল বিদ্বজ্জন ও শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে গণআন্দোলনের উপর তৎকালীন শাসক দলের দমনপীড়ন সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্তমান সময়ে এটাকে একটা বিতর্কের বিষয় বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। যা জটিলতর হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর বক্তব্যে। অপরদিকে 'অপারেশন সূর্যোদয়'-এর নামে নন্দীগ্রামের আন্দোলনকারীদের উপর শুরু হয় পুলিশ ও ঘাতক বাহিনীর নারকীয় অত্যাচার, শহিদ হন ১৪ জন, ক্ষত-বিক্ষত হন অনেকেই। তৎকালীন শাসক সিপিএমের বক্তব্য ছিল, 'আন্দোলনকারীদের উপর গুলিচালনা না করে কী ফুল ছোড়া হবে'। এই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্যেই দেখা মেলে আন্দোলন দমনে চটি জুতো পরিহিত পুলিশের, শুরু হয় বিতর্ক। এই বিষয়ে সরকার, শাসক দল নীরব, বিরোধীরা অভিযোগ তোলে এরা শাসক দলের হার্মাদ বাহিনী।

বর্তমান সময়ে এই চটি জুতো এবং পুলিশের পোষাক পরিহিত সমাজ বিরোধীরা প্রকৃতপক্ষে কোন দলের বা কোন নেতা বা নেত্রীর ছিল তা নিয়ে শুরু হয়েছে জলঘোলা, সেই ঘোলা জলে মাছ ধরার আশায় নেমেছে সিপিএম। তারা নির্বাচনী ফায়দা হাসিল করতে প্রচার করছে যে তারা এই অনভিপ্রেত ঘটনার সাথে যুক্ত নয় এবং উক্ত ঘাতকবাহিনী ছিল বিরোধীদের। সিপিএম-এর এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে ১) সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে সেই সময় কি এই বিষয়ে কোনও খবর ছিল না যে বিরোধীরা সেখানে ঘাতকবাহিনী জমায়েত করেছে? ২) ২৩৫ আসন পাওয়া মহাশক্তিধর সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সেই ঘাতকবাহিনীকে ধরার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

এই ঘটনাক্রম বিচার করলে সহজেই অনুমান করা যায় ১) তৎকালীন সিপিএম সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতি কতটুকু জনস্বার্থমূলক ছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি দখল করতে গিয়ে যে শিল্পায়ন এবং বেকারত্ব দূরীকরণের কথা তারা বলেছিল এবং এখনও পর্যন্ত বলছে তা প্রকৃতপক্ষে এক ভাঁওতা, যার বাস্তব ভিত্তি কিছু নেই, ২) এই বশ্যতাবিরোধী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল জনবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে, জাত-ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম। পরিশেষে এটুকুই বলার, নির্বাচনে জেতার স্বার্থে, ক্ষমতায় আসার জন্য সত্য বিকৃত করে এই ঐতিহাসিক গণআন্দোলন তথা সংগ্রামী জনসাধারণকে কালিমালিপ্ত করা কখনও সুস্থ মূল্যবোধের পরিচয় নয়।

সুজয় দাস
ছাত্র, বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা

সাফাইকর্মীদের দাবিতে সোচ্চার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

বাঁকুড়া পুরসভার সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দস্তানা, মাস্ক ও বিশেষ জুতো দেওয়ার দাবি তুলল এসইউসিআই (সি)। ৬ এপ্রিল এ নিয়ে বাঁকুড়ার চার্চ মোড় লাগোয়া এলাকায় সাফাই কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ বলেন, সাফাইকর্মীদের প্রায়ই ঝোপঝাড়ে ঢুকে কাজকর্ম করতে হয়। নোংরা জিনিস হাত দিয়ে তুলে সাফ করতে হয়। অথচ তাঁদের দস্তানা বা পায়ের জুতো দেওয়া হয় না। এমনকি করোনা পরিস্থিতিতেও তাঁদের মাস্ক দেওয়া হচ্ছে না। সাফাই কর্মীদের পর্যাপ্ত দস্তানা, জুতো ও মাস্ক দেওয়ার দাবিতে বৈঠকের পর বাঁকুড়া পুরভবনে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে এসব সরঞ্জাম দেওয়ার দাবি করেন এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিনিধিরা। পুরসভার তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতি জেনেও চুপ ইডি

দুয়ের পাতার পর

গুপ্তার মাধ্যমে ভারতীয় দরকষাকষির টিমের কম্পিউটার নথি পর্যন্ত দাসোর হাতে আগেই এসে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় প্রতিনিধিরা মুখ খোলার অনেক আগে দাসো তার ছক সাজিয়ে নিতে পেরেছিল।

যদিও এই রিপোর্টই প্রথম নয়, ফরাসি পোর্টাল 'ইন্টেলিজেন্স অনলাইন' ২০১৬ সালের মে মাসে একটি ইংরেজি প্রবন্ধে এই গুপ্তা ও তার পুত্রদের সাথে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় কর্তা এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর কিছু কর্তার দহরম-মহরমের কথা তুলে ধরে। শেষ পর্যন্ত রাফাল চুক্তিটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে প্রাক্তন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ওলান্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ওলান্দে ২০১৮ সালে একাধিকবার বলেছেন, চুক্তির অংশীদার হিসাবে রিলায়েন্সকে বেছে নেওয়ার পিছনে ফরাসি সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। ভারত সরকারের ইচ্ছাতেই তা হয়েছে।

মিডিয়াপার্ট আরও দেখিয়েছে, চুক্তিতে প্রথমে যে 'অ্যান্টিকরাপশন ক্লজ' অর্থাৎ ঘুষ এবং দুর্নীতি বিরোধী শর্ত রাখা হয়েছিল, গুপ্তার সাহায্যে দাসো তা চুক্তি থেকে বাদ দিতে সমর্থ হয়। ফলে ঘুষের কারবার হলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন আর দাসোকে ধরতে পারবে না। এই দুর্নীতি বিরোধী শর্ত বাদ দেওয়ার জন্য কোন কোন ভারতীয় কর্তাকে প্রভাবিত করা হয়েছিল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গরম গরম ভাষণ দানকারী বিজেপি সরকারের নেতারা জানেন! কিন্তু বলছেন না কেন? পশ্চিমবঙ্গে ভোট ময়দানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাজার গরম করতে তাঁরা যখন আসছেন, তাঁদের ধরে এ কথা জিজ্ঞাসা করাই তো আজ ভোটারদের কর্তব্য। ভোট এলেই বিরোধী নেতাদের মামলা নিয়ে উঠেপড়ে লাগে ইডি-সিবিআই তা এখন সকলে জানে। কিন্তু এতবড় অভিযোগ পেয়েও দুবছর ধরে ইডি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে কার নির্দেশে? এই জবাবটা তো নরেন্দ্র মোদি সাহেব তথা বিজেপিকে দিতেই হবে।

শীতলকুচির ঘটনার তীব্র নিন্দা

একের পাতার পর

সংযত আচরণ এবং ভবিষ্যতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও বাহিনী কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের সামনে গ্যারান্টি দেওয়ার কথা ঘোষণা করার দাবি করছি। সাথে সাথে কে বা কারা আনন্দ বর্মনকে গুলি করে হত্যা করল তারও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছি এবং ১২ এপ্রিল রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।'

একবার রাম হলে পরে কি আর বাম হয়!

বাবুদা পাড়ায় সক্রিয় সিপিএম কর্মী বলে পরিচিত। ভাল নাম একটা কিছু হয়ত আছে, তবে ডাক নামেই সবাই চেনেন। সেদিন চায়ের দোকানে তাঁকে দেখে বললাম, কী বাবুদা, খবর কী? কাজকর্ম কেমন চলছে?

বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, আগে এদের সরাই। তার পরে অন্য কাজ।

বললাম, কাকে সরাবেন?

আরে, যারা ক্ষমতায় আছে।

তা সরাবেন তো বটে! কিন্তু বদলে কাকে নিয়ে আসবেন? আপনাদের তো আর আসার কোনও চান্স নেই।

বললেন, এবার রাম।

বললাম, সে কী! বাম হয়ে রামকে নিয়ে আসবেন? তা ছাড়া তারা কি আরও খারাপ নয়?

বাবুদা, খানিকটা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, না, না, এত খারাপ সরকার এর আগে আসেনি। এদের সরাতেই হবে।

কিন্তু যাদের কথা বলছেন তারা তো আরও খারাপ।

বললেন, দেখি না পাঁচটা বছর। মানুষ ওদের দেখে নিলে তারপর তো আমরাই আবার ফিরে আসব।

বললাম, নতুন করে কী দেখবেন? এরা তো নতুন দল নয় যে নতুন করে দেখতে হবে! এ রাজ্যে না দেখলেও কেন্দ্রে সাত বছর ধরে দেখছেন। উত্তরপ্রদেশে দেখছেন, ত্রিপুরায় দেখছেন। সব মিলিয়ে ১৬টি রাজ্যে তারা ক্ষমতায় রয়েছে। কেন্দ্রের কিংবা ওইসব রাজ্যগুলোর দিকে একটু তাকালেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিষ কত খারাপ তা তো খেয়ে দেখাটা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।

বললেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ বার এ রাজ্যে আসল পরিবর্তন হবে।

বললাম, কেমন পরিবর্তন হবে তার টাটকা সাক্ষী তো ত্রিপুরা। আপনাদেরই তো পলিটবুরো নেতা মানিক সরকার। তিনি তো সাবধান করেছেন, এবার আর কেউ যেন রামে ভোট না দেয়। ত্রিপুরাতেও নাকি এখানকার মতোই বিজেপি নেতাদের আসল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে ভুলে সিপিএম সমর্থকরা রামে ভোট দিয়েছিল। আর এখন সরকারে বসে বিজেপি বিরোধীদের কথাই বলতে দিচ্ছে না। যে কোনও প্রতিবাদকেই পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে গায়ের জোরে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। ঘোষণা করেছে, কোনও চাকরিই আর স্থায়ী থাকবে না। সরকারি সব চাকরিই হবে চুক্তির ভিত্তিতে। তাদের বেতনও হবে সরকারি কর্মচারীদের বেতনের ভগ্নাংশ মাত্র।

বাবুদা বললেন, ত্রিপুরার কথা আলাদা। এখানে কোনও নেতা কি ও কথা বলছেন?

বললাম, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথায় আপনার এতখানি বিশ্বাসের কারণ কী? এর আগের নির্বাচনগুলিতে তাঁরা এমনই যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি কি পূরণ করেছেন? গ্যাস কেরোসিন জ্বালানি তেল সব কিছুর দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে তো কেন্দ্রের বিজেপি শাসনেই ঘটেছে। সব সরকারি সম্পত্তি তো জলের দামে এরাই পুঁজিপতিদের কাছে বেচে দিচ্ছে। রেল বেসরকারি হাতে দিয়ে দিচ্ছে। ভাড়া বাড়াচ্ছে লাফিয়ে। এর বোঝা তো আপনার উপরেও পড়ছে।

বললেন, লকডাউনের কারণে কিছুটা দাম বেড়েছে বটে, তবে করোনা চলে গেলেই আবার কমে যাবে।

বললাম, এ সব কথা তো বিজেপির নেতারা বলছেন। আপনি তো তাঁদের কথাগুলোই বলছেন। আপনার তো উচিত কথাগুলো যাচাই করে নেওয়া।

বললাম, আপনারা যা করছেন তার দ্বারা তো বিজেপির মতো একটি সাম্প্রদায়িক দলেরই শক্তিবৃদ্ধি করা হবে। যে বিজেপির কোনও সাংসদ ছিল না, আপনাদের কল্যাণে গত লোকসভা ভোটে তারা ১৮টা সাংসদ পেয়ে গেল, আর আপনারা শূন্য হয়ে গেলেন।

বাবুদা বললেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দেখবেন, তৃণমূলের সব নেতারা গিয়ে বিজেপিতে ভিড়বে। তখন আর তৃণমূল বলে কিছু থাকবে না। তখন আমরাই হব একমাত্র বিরোধী দল। মানুষ তখন আমাদেরই সমর্থন করবে।

বললাম, কিন্তু এই আমরাটা কারা? আপনি তো ইতিমধ্যেই বিজেপি হয়ে গেছেন। আপনার চিন্তার পদ্ধতিটাই তো আপনাদের নেতারা ইতিমধ্যেই পাল্টে দিয়েছেন। বিজেপির করা যুক্তিগুলোই বিজেপির মতো করে আওড়াচ্ছেন। আপনাদের যে নেতারা 'আগে রাম পরে বামে'র স্লোগান তুলেছিলেন এবং এখনও কখনও প্রকাশ্যে, কখনও আড়ালে আওড়াচ্ছেন তাঁদেরই কি আর বামত্ব কিছু আছে!

বাবুদা বললেন, দলে এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় ফিরতে গেলে এ ছাড়া যে আর কোনও রাস্তা নেই!

বললাম, ক্ষমতায় ফেরার জন্য বামপন্থীরা কি যে কোনও রাস্তা নিতে পারে? তা হলে তো বামপন্থাকেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বললাম, আপনাদের নেতাদের এই ভাবনার সাথে বামপন্থা দূরের কথা গণতান্ত্রিক ভাবনারও কোনও সম্পর্ক নেই। যে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো স্বাধীনতার পর কোনও দিন এ রাজ্যে জায়গা করতে পারেনি, তাকেই আপনাদের নেতাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এ রাজ্যে জায়গা করে দিল।

বললাম, আপনাদের নেতারা ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে দলের মধ্যে বামপন্থার আর অবশিষ্ট কিছু রাখেননি। না হলে, যদি এটা ছয়ের দশকের ঘটনা হত, যদি সেদিন নেতারা এমন করে কর্মীদের দক্ষিণপন্থী দলে ভোট দিতে বলতেন, তবে দলে তীব্র প্রতিবাদ উঠত। নেতারা সমালোচনায় বিদ্ধ হতেন।

বাবুদা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখুন, আমি কিন্তু এই স্লোগানটা প্রথম শোনার পরে প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, বামপন্থী হিসাবে এটা আমরা করতে পারি না। কিন্তু নেতারা বললেন, ক্ষমতাতেই যদি না থাকতে পারি তবে বামপন্থা কী কাজে লাগবে? তার উত্তর করতে পারিনি।

আমি বললাম, বাবুদা, আপনি তো বলবেনই। আপনি তো আসলে বামপন্থী। কিন্তু দেখুন, নেতৃত্ব আপনার মতো এমন অসংখ্য বামপন্থী কর্মী-সমর্থকদের কী ভাবে শুধুমাত্র গদির লোভে ভুল বোঝাচ্ছে। এই সর্বনাশের রাস্তা থেকে আপনাদের ফিরে আসতে হবে। বামপন্থীদের উপরই যে সমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

বাবুদা দু কাপ চা দিতে বলে বললেন চায়ের দামটা কিন্তু আমি দেব।

'গরিব মানুষের কথা বলছ তোমরাই'

সারা রাজ্য জুড়ে চলছে নির্বাচনী প্রচার। একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সহ নামকরা সব নেতারা শত শত কোটি টাকা খরচ করে চার্টার্ড প্লেন, হেলিকপ্টার, রথে পরিবর্তিত অত্যাধুনিক বাস ইত্যাদি হাঁকিয়ে প্রায় রোজ পশ্চিমবঙ্গ চষে ফেলছেন। তাঁদের জৌলুস আর হাঁক ডাকে চারিদিক সরগরম। অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও রোজই কোনও না কোনও জেলায় গিয়ে চোখা চোখা বাণী দিচ্ছেন। এদের সকলের প্রতিটি সভার খুঁটিনাটি তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যমের ব্যস্ততার শেষ নেই।

এই প্রচারের প্রবল জাঁকজমক, জৌলুস আর হাঁকডাকের বিপরীতে নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই চলছে আর একটি ধারা। যে ধারার কথা করপোরেট মালিকদের টাকায় চলা বৃহৎ সংবাদমাধ্যম পারতপক্ষে মুখে আনতে চায় না। অথচ এই ধারাটাই টানে গরিব-মধ্যবিত্ত-খেটে খাওয়া মানুষকে। পায়ে হেঁটে, ঘরে ঘরে গিয়ে, কখনও বা পথসভা, কখনও বা সাইকেলে লাগানো মাইকের ভরসায় এই ধারার কর্মীরা জিতে নেন মানুষের মন। পেয়ে যান গরিব-মধ্যবিত্ত-খেটেখাওয়া মানুষের হৃদয়, মানুষের উজাড় করা শ্রদ্ধা, ভালবাসা। এই ধারার প্রতিনিধি হলেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী এবং দলের প্রার্থীরা।

যেমন দেখা গেল নদীয়া জেলার শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাঁতশিল্পী কমরেড নদীয়াচাঁদ বিশ্বাসের প্রচারে। শান্তিপুরের নীলকুঠি গ্রামে সংগঠনের কর্মীরা প্রচারে গিয়ে অনুভব করলেন, একটা অদ্ভুত স্বতঃস্ফূর্ততা মানুষের মধ্যে। অন্য দলগুলি ভোটের সময় টাকা ছড়ায়, চায় গরিব মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের ভোট কিনতে। আর এস ইউ সি আই (সি) গরিব মহল্লায় গিয়ে ভোটের প্রচারের সাথে সাথে টাকা চাইছে! বলছে, যে যেমন পারেন দিন। এই তিল তিল করে গড়ে তোলা তহবিলেই চলে এ দলের ভোটের প্রচার। শান্তিপুরের এই গ্রামেও দেখা গেল বড় কষ্টের রোজগার থেকে একটু একটু টাকা মানুষ তুলে দিচ্ছেন দলের কর্মীদের হাতে। ঠিক যেন নিজের সন্তানকে বড় করার জন্য পিতা-মাতার কর্তব্য বোধের টানের মতোই এ দান।

ঘুরতে ঘুরতে কর্মীরা দাঁড়ালেন এক দরিদ্র বিধবা মহিলার ঘরের দরজায়। সংসারে তিনি একা। তাঁতের কাজ করে নিজের পেট চালান। নিজের ছেলে তাঁকে দেখে না। দলের কর্মীরা ভোট চাইবার পর অনুরোধ করলেন, '১০টা টাকা সাহায্য দিতে পারেন'! তিনি বার করে আনলেন ২০ টাকা। দারিদ্রের ছাপ তাঁর ঘরের সর্বত্র। যা দেখে এক কর্মী বলেই ফেললেন, আপনি ১০ টাকাই দিন, না হলে হয়ত আপনার অসুবিধা হবে'! একটু হেসে বললেন সেই বৃদ্ধা 'আমি একা থাকি। টাকার কষ্ট আমার আছেই, তবুও তোমাদের কিছু দিতে পেরে নিজেই খুশি হলাম। তোমরাই গরিব মানুষের কথা বলছ। আর যদি মদ বন্ধ করতে পার খুবই ভাল হয়।' সে ঘর থেকে ফিরতে ফিরতে সকলে বাকরুদ্ধ। শোনা গেল এক কর্মীর স্বগোতক্তি, 'কত বড় আশা শুধু আমাদের নিয়ে! এর দাম আমাদের দিতেই হবে'।

কলকাতার বেলেঘাটা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী অধ্যাপক তরুণ কুমার দাসের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষ। এক সময়কার সিপিএম সমর্থক এক তরুণ, পেশায় গৃহশিক্ষক। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না সিপিএম-কংগ্রেস-আব্বাসের

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

তিনের পাতার পর

সমাজচিন্তাও শ্রেণিরূপ ধারণ করেছে। একদিকে মালিকশ্রেণি বা শোষকশ্রেণির চিন্তা, অপরদিকে শোষিতশ্রেণির চিন্তা। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, অপরদিকে প্রগতিশীল চিন্তা— এ'দুটোই আছে। একটি বিশেষ সমাজের মধ্যে যেভাবে সমাজচিন্তা একটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে 'পারসনিফিকেশন' (ব্যক্তিকরণ) ঘটে— তাই হল ব্যক্তিচিন্তা। তাই, কী করে ব্যক্তি শ্রেণির ঊর্ধ্বে, সমাজের ঊর্ধ্বে উঠবেন? রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বা বিবেকানন্দের চিন্তা হচ্ছে সমাজচিন্তার একটি বিশেষ ধরনের ব্যক্তিকরণ। এই চিন্তা আবার সমাজচিন্তাকে প্রভাবিত করছে— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিচিন্তার পারস্পরিক সম্বন্ধ 'ডায়ালেকটিক্যাল' (দ্বন্দ্বমূলক) অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ— একে অপরকে প্রভাবিত করে। এখানে মূল যে কথাটা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, সমাজচিন্তাই ব্যক্তিচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তিকৃত হয়, ব্যক্তিকরণ হয়— এরই নাম ব্যক্তিচিন্তা। 'পারসনিফিকেশন অব সোস্যাল থিঙ্কিং ইজ ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং'। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সামাজিক চিন্তা যেখানে শ্রেণিচিন্তা সেখানে কোন ব্যক্তিই শ্রেণিস্বার্থ থেকে মুক্ত ব্যক্তি নয়। যিনি যত বড় মহামানবই হোন, তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারুন আর না পারুন— কোনও না কোনও শ্রেণিস্বার্থের সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হয়, কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তাকেই তাকে প্রতিফলিত করতে হয়। ফলে, এরূপ অবস্থায় জেনে হোক বা না জেনে হোক, যখন কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তার সাথে সবাইকে যুক্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে তখন বাস্তবে কোনও না কোনও শ্রেণিস্বার্থ নিয়েই চলব, অথচ নিজে ভাবতে থাকব— 'আমি কোন শ্রেণির সাথেই যুক্ত নই, আমি গোটা সমাজের স্বার্থ নিয়েই ভাবছি'— এর চেয়ে অজ্ঞতা ও আত্মপ্রতারণা আর কিছু হতে পারে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

আন্দোলনের চাপে ঘাটালে নদী ও খাল সংস্কার শুরু

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সংগ্রাম কমিটি নদী ও খাল সংস্কারের দাবিতে বহু বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের ফলে মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত দুর্বাচটি, ক্ষীরাই-বাকসি, নিউ কাঁসাই, চন্দ্রেশ্বর, গোমরাই, পায়রাশি প্রভৃতি নদী ও খালগুলি রাজ্য সেচ দপ্তরের অর্থে চলতি বছরে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৫টি ব্লকে বন্যার প্রকোপ অনেকটা কমবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল সোনার বাংলা গড়ার দাবিদার কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এই প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুর করেনি। রাজ্য সেচ দপ্তরের বাজেটের টাকায় ২০১৮ সালে ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পলাশপাই নদী সংস্কার হয়েছিল। পরবর্তী ধাপে ২০২০ সালে ২৬.৫ কিমি দীর্ঘ দুর্বাচটি ও ২১ কিমি দীর্ঘ নিউ কাঁসাই (নিম্নাংশ) নদী এবং ২৬.৭ কিমি দীর্ঘ ক্ষীরাই-বাকসী বেসিন স্কিমের অন্তর্গত খাল ও ১৪ কিমি দীর্ঘ চন্দ্রেশ্বর, ৮ কিমি দীর্ঘ পায়রাশি, ৪ কিমি দীর্ঘ গোমরাই খালগুলি প্রায় ২১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমানে জোরকদমে সংস্কারের কাজ চলছে। কংসাবতী সংলগ্ন উপরোক্ত নদী ও খালগুলি পূর্ণ সংস্কারের কারণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, ময়না এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর-১ ও ২ ব্লক এলাকার বন্যা সমস্যা অনেকটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান— বন্যার প্রকোপ কমার পাশাপাশি রূপনারায়ণের জলে এলাকার ধান-ফুল-সবজি চাষেরও উপকার হবে।

সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক ও দেবাশিষ মাইতি বলেন, নদী ও খাল সংস্কারের ওই কাজকে আন্দোলনেরই জয়। তাঁদের দাবি স্কিমটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ধাপে ধাপে নিকাশি নদী ও খালগুলি পূর্ণ সংস্কার করতে হবে। পরবর্তী ধাপে শিলাবতী নদী খনন ও ওই সংলগ্ন কেটিয়া নদী ও তার শাখা খালগুলি সংস্কার এবং চন্দ্রেশ্বর খালকে শিলাবতী নদীর সাথে যুক্ত করার দাবি সম্প্রতি সেচ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে জনানো হয়েছে।

রক্তাক্ত নির্বাচনের নিন্দায় বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ গভীর ব্যথা ও ক্ষোভের সঙ্গে ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে পাঁচ জনের মৃত্যু, বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে পর পর প্রার্থী, রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ নির্বাচকদের উপরে আক্রমণ, বোমাবাজি, ভোটদানে বাধা, এমনকী সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং মৃত্যুর নিন্দা করছি। এই ঘটনাতে কেন্দ্রের শাসক দল এবং রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে।

আমরা দাবি করেছিলাম, প্রত্যেক ভোটার যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে তা নির্বাচন কমিশন, সরকারি প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল যেভাবেই হোক ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। অভিযোগ উঠেছে, রক্তাক্ত নির্বাচন এরই ফল। এতে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই দরিদ্র এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের দাবি, প্রত্যেক নির্বাচককে তাঁর ভোট দেওয়ার অধিকার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

গরিব মানুষের কথা

সাতের পাতার পর

জোটকে। তাঁর বাড়িতেই একদিন ডেকেছিলেন নিজের কিছু উঁচু ক্লাসের ছাত্র ও এক বন্ধুকে। ব্যবস্থা করেছিলেন, এস ইউ সি আই (সি) দলের বক্তব্য তাদের শোনাতে। ৩ এপ্রিল ফুলবাগান মোড়ে যখন বক্তব্য রাখছেন দলের প্রার্থী, দেখা হল সঞ্জয় বাবুর সঙ্গে। অনেক দিন সিপিএম করেছেন, কিন্তু বামপন্থার প্রতি যে আকর্ষণ থেকে ওই দলে গিয়েছিলেন, আজ বুঝছেন বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়েছে তারা। এস ইউ সি আই (সি) আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা নিয়ে গেলেন। নতুন করে রাজনীতিকে চিনতে চাইছেন তিনি। ওই এলাকারই সাগ্নিক, সুপ্রতীক বামপন্থী বলতে পরিবার থেকে এতদিন চিনেছেন সিপিএমকেই। আজ ধাক্কা খেয়েছে তাঁদের স্বপ্ন। পথ খুঁজতে গিয়ে পেয়েছেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনীতির সন্ধান। চাইছেন আরও ভাল করে বুঝতে।

এই কেন্দ্রেরই ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের চার নম্বর বস্তিতে, প্রচারের সময় দুটি পরিবারে প্রায় একই অভিজ্ঞতা। বলেছেন তাঁরা, তোমরাই আমাদের ভোটার স্লিপ দিয়ে যাবে, অন্যদেরটা নেব না। বই এবং কাগজ চেয়ে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, এবার ভোটে আমাদের সমর্থন তোমাদের দিকেই।

সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের আন্দোলন বাঁকুড়ায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন বাঁকুড়া কালেক্টরেট ইউনিটের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সদর মহকুমার অধীন কর্মরত সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাদের দাবি, ১) অবিলম্বে সিভিল ডিফেন্স ভোলেন্টিয়ারদের ১২ ঘন্টার ডিউটি বন্ধ করতে হবে, ২) সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের জেলার হাসপাতালগুলিতে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, ৩) সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারদের সারা মাসের কাজের বন্দোবস্ত ও সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার সুজিত পাল, পিনাকী কর্মকার, সৌরভ চট্টরাজ, ইউনিট কনভেনর বৈদ্যনাথ মুখার্জী ও প্রণব কুমার নায়েক সহ ৭ জনের প্রতিনিধি জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে ডিডিএমও-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিটি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ডিডিএমও জানান ১২ ঘন্টার কাজের ব্যাপারে তিনি ডাইরেক্টরেটের কাছে ৮ ঘন্টার কাজের অনুমতি চেয়ে চিঠি দেবেন ও যাতে প্রতিটি ভলেন্টিয়ার মাসে ২৮ দিনের কাজ পান সে ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

কুলতলিতে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত দলের পোলিং এজেন্ট

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি কেন্দ্রের বেশ কিছু এলাকা জুড়ে ভোটের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই চলেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাস। এর মধ্যেও অনমনীয় দৃঢ়তায় বিপ্লবী রাজনীতির ঝাণ্ডা নিয়ে কুলতলিতে নির্বাচনী লড়াই চালিয়ে গেছেন এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতা-কর্মীরা। কোনওভাবেই এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতি মানুষের সমর্থন নষ্ট করতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ভোটের দিনে আক্রমণ চালালো তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। মৈপীঠের মিলন এফপি স্কুলের ২৬০ নম্বর বুথে দলের পোলিং এজেন্ট কমরেড জয়ন্ত জানা গুরুতরভাবে আহত হলেন তাদের আক্রমণে।

এক সময় সিপিএমের আশ্রয়ে থাকা দুষ্কৃতীরাই এখন তৃণমূলে ভিড়েছে। তৃণমূলের প্রার্থী ওই এলাকায় এবার যিনি হয়েছেন, সেই গণেশ মণ্ডল এবং তাঁর পরিবার এক সময় সিপিএমের হয়ে দুষ্কৃতী বাহিনীর সঙ্গে মিলে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। বেশ কয়েকজন কর্মী নেতা তাদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। গত বছর ২০২০-র ৪ জুলাই এই তৃণমূল দুষ্কৃতী বাহিনী মৈপীঠ অঞ্চলের বিশিষ্ট জননেতা এবং এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুধাংশু জানাকে নৃশংশভাবে হত্যা করে। বহু মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ওই সময় থেকেই তারা একটানা সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে মৈপীঠ জুড়ে। কিন্তু এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতি মানুষের সমর্থনকে দমাতে পারেনি। ভোটের আগে বারবার নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশকে এমনকি বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষককেও দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল মৈপীঠে সন্ত্রাসের পূর্ব ইতিহাস আছে। এমনকি ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সেখানে পোলিং এজেন্টরা আক্রান্ত হয়েছেন। দাবি করা হয়েছিল কমিশন বিশেষভাবে জনগণ এবং পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তার দিকে নজর দিক। কিন্তু তারা যে কিছুই করেনি তা বোঝা গেল ৬ এপ্রিল ভোটের দিন।

হাসপাতালে আহত কমরেড জয়ন্ত জানা

৬ এপ্রিল তৃতীয় দফা ভোটের দিন, ভোট শেষ হওয়ার পর মৈপীঠের মিলন এফপি স্কুলে ভোটের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ওই বুথে দলের পোলিং এজেন্ট কমরেড জয়ন্ত জানা দেখেন তাঁর বাড়ি ফেরার রাস্তায় প্রচুর দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। তিনি তাঁর এক সঙ্গীর মোটর বাইকে অন্য রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন। তাঁকে অন্য রাস্তায় যেতে দেখে ওই দুষ্কৃতী বাহিনীও পিছু নেয়। কিছুটা এগিয়ে জিৎ মোড়ের কাছে একদল তৃণমূল কর্মী তাঁদের পথ আটকায়। ইতিমধ্যে ওই বাহিনীও এসে পড়ে। তৃণমূল নেতা সুনীল দাসের নেতৃত্বে লাঠি রড দিয়ে মেরে কমরেড জয়ন্ত জানাকে তারা মাটিতে ফেলে দেয়। তাঁর গলা টিপে ধরে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় এক যুবকের সাহায্যে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। দলের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। তৃণমূলের ওই বাহিনী এবং সুনীল দাস এরপরেও এলাকার মানুষকে শাসাতে থাকে, কেউ কোনও কথা ফাঁস করলে তার অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হবে। এলাকার এস ইউ সি আই (সি) সমর্থকদের বাড়িতে বাড়িতে তারা হামলা চালায়। কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। দলের পক্ষ থেকে বারবার কমিশন এবং প্রশাসনকে ঘটনা জানালেও তাদের কোনও হেলদোল টের পাওয়া যায়নি।

কুলতলির প্রার্থী কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছেন, অবিলম্বে সুনীল দাস সহ এই দুষ্কৃতী বাহিনীকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com